পবিত্র আহলে বাইত ও চিরকালের কান্না

আবদুল মুকীত চৌধুরী

১. আহলে বাইত

'আহলে বাইত' সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কালাম : "...হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।"– আল-কুরআনুল করীম, সূরা আহযাব ৩৩ঃ আয়াত ৩৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

'...And God only wishes / To remove all abomination / From you, ye Members / Of the Family, and to make / You pure and spotless.'- The Holy Quran: Translation and Commentary, A. Yusuf Ali, Page 1115-16.

'আহলে বাইত' সম্পর্কে ব্যাখ্যা-ভাষ্যে আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন,

"Notice the transition in this clause to the masculine gender, while before this the verbs and pronouns were in the feminine gender as referring to the consorts. The statement in this clause is now more general, including (besides the consorts) the whole family, namely, Hazrat Fatima the daughter, Hazrat 'Ali the son-in-law, and their sons Hasan and Husain, the beloved grandsons of the Prophet. The masculine gender is used generally in speaking of a mixed assembly of men and women." - Ibid, P.1116

দশম হিজরিতে নাজরানের এক খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল প্রধান ধর্মযাজক আবু হারিসা ইবনে আলকামাহ এর নেতৃত্বে মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মুবাহালার মানসে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আহলে বাইতের সদস্য 'আলী (রা.), ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা)-কে তাঁর চাদরের মধ্যে নিয়ে প্রতিনিধিদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের পবিত্র চেহারার প্রভাবে যাজক মুগ্ধ হয়ে মুবাহালা থেকে বিরত হন এবং এই পবিত্রতা সকল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হবে বলে ঘোষণা করেন।

আল্লামা যামাখশারী মুবাহালার আয়াত সম্পর্কিত ব্যাখ্যার শেষে বলেন, "মুবাহালার মহা ঘটনা এবং এ আয়াতের বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ 'আসহাবে কিসা' অর্থাৎ মহানবী (সা.) যাঁদেরকে তাঁর চাদরের নিচে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দলিল এবং ইসলাম ধর্মের সত্যতারও এক জীবন্ত সনদ।"– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড, আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী, অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান, পৃ. ৩৭১

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ধর্মযাজকের কথাবার্তা হয়। 'ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র' এই বিশ্বাসের অবস্থানে যাজক। এ সময় সূরা আলে

ইমরানের ৫৯ নং ক্রমিকের আয়াত নাযিল হয় : "আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর উহাকে বলিলেন, 'হও'; ফলে সে হইয়া গেল।"

আলে ইমরানের ৬১তম আয়াত মিথ্যায় বিশ্বাসীদের মুবাহালায় যাওয়া এবং নিজেদের উপর স্রষ্টার লানত (অভিশম্পাৎ) চাওয়া সংক্রান্ত। এর টীকায় বলা হয়েছে, 'নাজরান অঞ্চলের খৃষ্টানগণ ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা স্বীকার না করিলে আল্লাহর নির্দেশে হযরত (সা.) তাহাদিগকে মুবাহালার (দুই পক্ষের পরস্পরের জন্য বদ দু'আ করা) জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু খৃষ্টান পাদ্রীগণ ভীত হইয়া ইহা হইতে বিরত থাকনে ও জিযয়া দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন।' –জালালাইন; আল কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৮৬

ইমামুল মু'মিনীন 'আলী (রা.) এই বিশেষ বিজয়ের সন্ধি চুক্তিপত্র লিখেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার আহলে বাইতের সদস্যগণ আমার উম্মতের জন্য তেমনি নাজাতের তরী, যেমনি আল্লাহর নবী নূহ (আ.)-এর তরী বিধ্বংসী বন্যার সময় তাঁর জন্য আশ্রয় ও নাজাতের তরী ছিল।"

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, 'ইয়া আহলে বাইতে রাসূল। আপনাদের মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালবাসা) পবিত্র কুরআনে ফরয করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামাযে আপনাদের উপর দরুদ না পড়বে, তার নামাযই কবুল হবে না।'– সাওয়ায়েকে মোহরেকা, ইবনে হাজার মক্কী, পৃ. ৮৮, ৭৭১

২. আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা.)

রাহমাতুল্লিল 'আলামীন সায়্যিদুল মুরসালীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে 'আলী (রা.)-এর পারিবারিক নৈকট্য ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল অনন্য। 'আলী (রা.)-এর পিতা আবূ তালিব মুহাম্মদ (সা.)-কে পিতৃস্নেহে ও মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ মাতৃস্নেহে লালনপালন করেন। পিতা 'আবদুল্লাহ-র মৃত্যু ও পরবর্তীতে মাতা আমেনার মৃত্যুর পর বিশেষভাবে তাঁর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁরা। সেই পরম শ্রদ্ধেয় চাচা-চাচীর সন্তান 'আলী (রা.)। তিনিই প্রথম তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। সর্বোত্তম ফয়সালাকারী (কাযী) তিনি।

গাদীরে খুমে উপস্থিত সাহাবিগণের অঙ্গীকার গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি যার মাওলা, 'আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি তাকে বন্ধু গণ্য করো, যে একে ('আলীকে) বন্ধু গণ্য করে এবং যে একে ('আলীকে) শত্রু গণ্য করে, তাকে শত্রু গণ্য করো এবং রাগান্বিত হও তার প্রতি যে একে রাগান্বিত করে।"

খায়বারে হযরত 'আলীর মহাবিজয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) আগেই বলেন, "আগামীকাল এ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। সে এমন ব্যক্তি, যে শত্রুর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি এবং কখনই যুদ্ধ হতে পলায়ন করেনি।"– চিরভাস্বর মহানবী (সা.) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৮। সূত্র : মাজমাউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২০; সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৭; সীরাতে ইবনে হিশাম ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।

খায়বারের দরজা উপড়ানোর শক্তিমত্তার অলৌকিকতার দিকটিতে জিজ্ঞাসার জবাবে 'আলী (রা) বলেন, 'আমি কখনো মানবীয় শক্তিতে তা উপড়াইনি; বরং আল্লাহর শক্তি ও মহান আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের বলে তা করেছি।"– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২। সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২১।

আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা.) তাঁর এক ভাষণে স্পষ্ট করে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।... আমি তাঁকে গোসল দিয়েছি এবং ঐ অবস্থায় ফেরেশতারা আমাকে সাহায্য করেছেন।"– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২৯। সূত্র : নাহজুল বালাগাহ।

হযরত 'আলী (রা.) খারিজী ইবনে মুলজিমের আঘাতে গুরুতর আহত ও ওফাতশয্যায় থাকা অবস্থায় হাসান (রা)-কে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন।

৩. খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চির বিশ্বস্ত নারীশ্রেষ্ঠ খাদিজা তাহেরা (রা.)-এর কন্যা ফাতেমা (রা.)। রাসূল (সা.) বলেন, "ফাতেমা আমার দেহের টুকরা। যা তাকে সন্তুষ্ট করে, তা আমাকেও সন্তুষ্ট করে; আর তার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি আমারই ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি।"– সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১

কন্যার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে সফরে বেরোতেন না তিনি এবং ফিরেও প্রথমেই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। যে কয়েক দিন

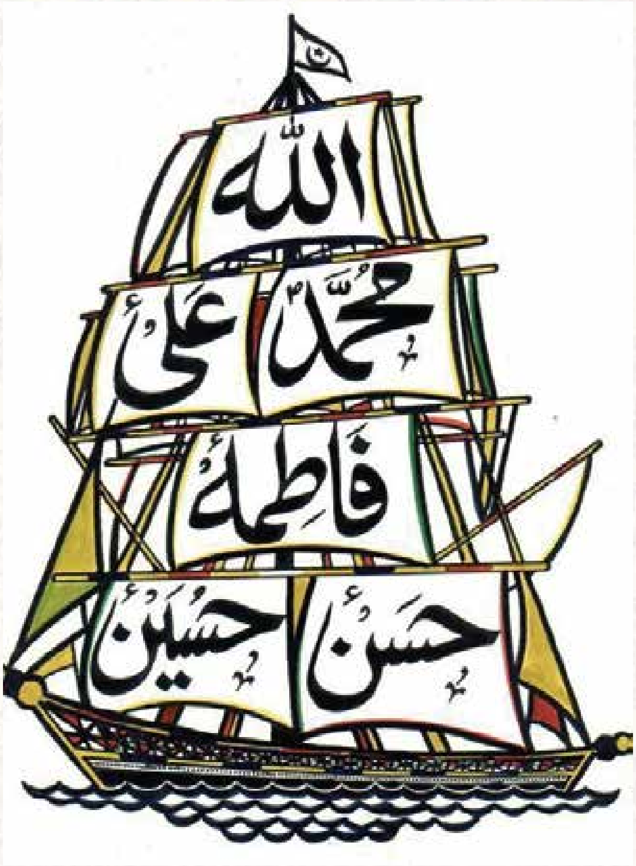

রাসূল (সা.) ওফাত-শয্যায় শায়িত ছিলেন, সে দিনগুলোতে ফাতেমা (রা.) পিতার শয্যাপাশে বসে থাকতেন। এ সময়ে পিতার কাছ থেকে তাঁর আসন্ন ওফাতের কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন। আবার রাসূল (সা.)-এর সাথে তিনিই প্রথম মিলিত হবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে হাসেন তিনি। রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, "আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।"– আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯

মহানবী (সা.)-এর এখতিয়ারে ছিল বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ একটি উর্বর অঞ্চল ফাদাক। এটি ছিল খায়বারের কাছে। নিকটাত্মীয়গণের বৈধ প্রয়োজনাদি সম্মানজনকভাবে মেটাতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে সূরা শূরার ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে। সূরা ইসরার ২৬তম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিতে কন্যা ফাতেমাকে ডেকে ফাদাকের স্বত্ব হস্তান্তর করেন নবীজী। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত এ হাদীস।– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড। সূত্র : মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১; শরহু নাহজুল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮

খিলাফত প্রশাসন প্রাথমিক পর্যায়ে ফাতেমা (রা.)-এর এ দাবির স্বীকৃতি দেন নি।– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড। সূত্র : ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজুল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; সীরাতে হালাবী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০

মালে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকেও আহলে বাইত কিছু পেতেন না।– ঐ, সূত্র শারহু নাহজুল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, ২৩৬

শেরে খোদা হযরত 'আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুয়াবিয়ার শাসনকালে তিনি মারওয়ান, আমর ইবনে উসমান ও পুত্র ইয়াযীদের মধ্যে ফাদাক বণ্টন করে দেন। মারওয়ানের দায়িত্বকালে সকল অংশ তার পুত্র আবদুল আযীযকে হিবা করে দেয়। এ ধারা চলতে থাকে। বনী উমাইয়্যা শাসকদের মধ্যে 'উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ফাদাক ভূখণ্ড হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধরদের কাছে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে মূল মালিকানা হাতে রেখে সম্পত্তির ব্যয় ফাতেমা (রা.)-এর বংশধরদের মধ্যে বণ্টনে তাঁকে রাজি করা হয়েছিল।"- চিরভাস্বর মহানবী (সা.), দ্বিতীয় খণ্ড। সূত্র : ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজুল বালাগাহ, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৭৮

তাঁর ইন্তেকালের পর পরবর্তীরা ফাদাক সরকারে ফিরিয়ে নেয়। বনী উমাইয়্যা শেষ দিন পর্যন্ত কর্তৃত্বে ছিল।

হযরত 'আলী (রা.) বসরার গভর্নর 'উসমান ইবনে হুনাইনের কাছে লেখা এক পত্রে ফাদাক প্রসঙ্গে বলেন, "হ্যাঁ, যেসব কিছুর উপর আকাশ ছায়া প্রদান করেছে, সে সবের মধ্যে ফাদাক গ্রামের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূ-সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের হাতে (কর্তৃত্বে) ছিল। কিন্তু কোনো কোনো গোষ্ঠী এ ব্যাপারে কার্পণ্য করল। আর একদল উদার ও মহানুভব ব্যক্তি বিশেষ কতিপয় বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। তবে মহান আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।"- নাহজুল বালাগাহ, পত্র ৪৫

৪. ইমাম হাসান বিন 'আলী (রা.) : সায়্যিদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ

বারা বিন আযীব (রা) থেকে বর্ণিত : "আমি হাসানকে রাসূল (সা.)-এর কাঁধ মুবারকে দেখলাম। আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি। সুতরাং আপনিও তাকে ভালবাসুন।"- বুখারী শরীফ; মুসলিম শরীফ, বাবু ফাযাইলিল হাসানী ওয়াল হুসাইনী।

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত : "মদীনায় বাজার থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা.) বললেন, 'ছোট শিশুটি কোথায়?' এ কথা তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, 'হাসান ইবনু 'আলীকে ডাকো।' দেখা গেল হাসান ইবনু 'আলী হেঁটে আসছেন। তাঁর গলায় ছিল মালা। নবী (সা.) এভাবে তার হাত উঠালেন। হাসানও এভাবে তাঁর হাত উঠালেন। তারপর রাসূল (সা) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি; আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে, তাকেও আপনি ভালবাসুন।'- বুখারী শরীফ

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইমাম হাসান (রা.) খলীফা হন। আমীরে মুয়াবিয়া তাঁর খিলাফত মেনে নিতে অস্বীকার করলে ইমাম হাসান তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। অতঃপর ৫০ হিজরিতে ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

৫. ইমাম হুসাইন বিন 'আলী (রা.): সায়্যিদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ

ইমাম হাসান (রা.)-এর পর পবিত্র আহলে বাইতের কনিষ্ঠ সদস্য ইমাম হুসাইন (রা.)। তাঁর প্রতি মুসলিম জনগণের 'ভালবাসা ও আনুগত্য' সর্বোচ্চ থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনচেতনায় তা ছিলও। কিন্তু পিতৃসূত্রে ক্ষমতাধর খিলাফতের পদলোভী ইয়াযীদের পক্ষ থেকে বিস্ময়করভাবে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কাছে 'আনুগত্য' তথা বায়'আতের দাবি করা হয়। তাতে আত্মসমর্পণ না করলে ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত মানবজাতি তথা সৃষ্টিজগতের প্রতি কল্যাণ ও শান্তির বার্তাবাহী রাসূল রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরম আদরের দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) মাথা নত করলেন না। ফলে কারবালায় ইয়াযীদের নির্দেশিতদের আক্রমণে অবাঞ্ছিত অসম যুদ্ধে পানিবিহীন অবস্থায় ইমাম পরিবারের সদস্যসহ ৭২জন ফোরাত তীরে শহীদ হন। পিতা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত 'আলী (রা.)-এর শাহাদাত এবং বড় ভাই ইমাম হাসান (রা.)-এর বিষপ্রয়োগে শাহাদাতের পর এ শাহাদাত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তো বটেই, গোটা মানবেতিহাসেও অনন্য করুণ। ইয়াযীদ ও তার দোসরদের পাশবিকতার প্রতি উম্মাহর তথা বিশ্বমানবতার ধিক্কার। এর বিপরীতে রাসূল (সা.) ও ইমাম প্রেমিকরা চিরকাল শ্রদ্ধা জানাবে মূলত অপরাজেয় 'মৃত্যুহীন' কালোত্তীর্ণ ইমামকে।

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কাছ থেকে জোরপূর্বক বায়'আত গ্রহণের জন্য মদীনার গভর্নর ওয়ালিদের কাছে ইয়াযীদ এক পত্রে নির্দেশ দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর শির কেটে তার কাছে পাঠানোর জন্য।

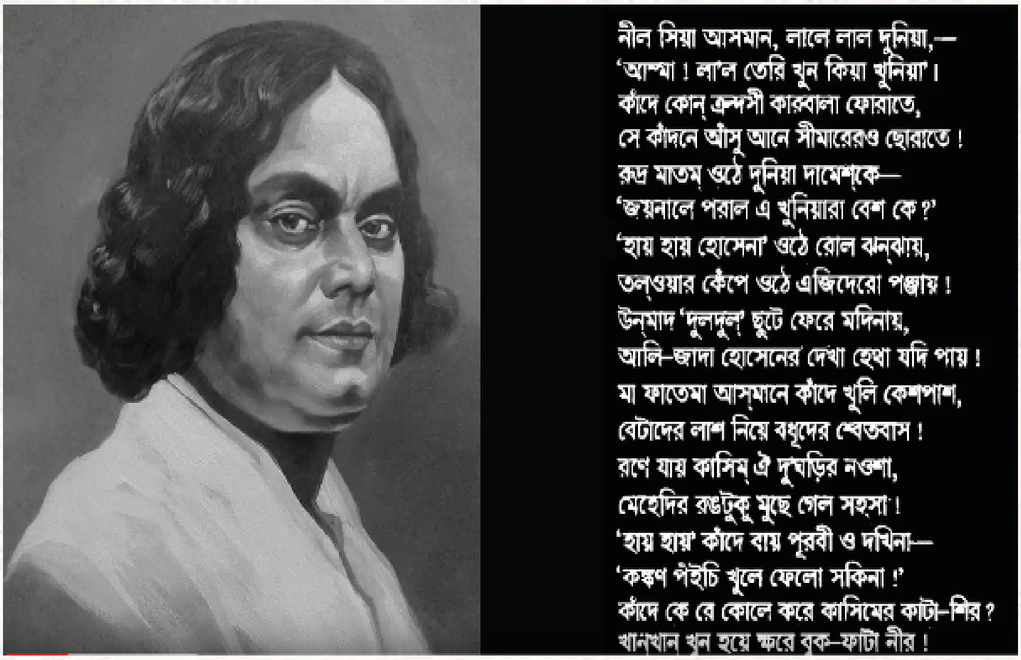

ইবনে যিয়াদ বলে, 'আমি আল-হুসাইনকে হত্যা করেছি; কারণ, তিনি আমাদের ইমাম (ইয়াযীদ)-এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছিলেন এবং এই ইমামই (ইয়াযীদ) হুসাইনকে হত্যার জন্য আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। হুসাইনের হত্যা যদি পাপ হয়ে থাকে, তা হলে এ জন্য ইয়াযীদ দায়ী।'

বিষয়টি শুধু এ হত্যায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তীতে পবিত্র মক্কা ও মদীনা আক্রান্ত হয়েছে। বহু জীবন হানি ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। সত্য-মিথ্যার যুদ্ধে কারবালার অনন্য শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের পর আল্লাহর ঘর কা'বা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্মৃতিবাহী মদীনা আক্রমণের দুঃসহ ব্যথা নিয়ে মুসলিম উম্মাহ হাজার ও শত শত বছর পাড়ি দিচ্ছে। আল্লাহর খিলাফত– মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তির শাসন ব্যবস্থা স্তব্ধ করে দিয়েছে অবৈধ রাজতান্ত্রিক ক্ষমতালোভী ও পরবর্তীতে তাদের দোসররা।

কুরআন মজীদের ৩৭তম সূরা সাফ্ফাত-এর ক্রমিক ১০৭তম আয়াত 'মিল্লাতের পিতা' নবী ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তাঁর সন্তান ইসমাঈল-এর কুরবানির মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বিকল্প কুরবানি বিষয়ক : "আর আমি তাকে মুক্ত করলাম বিরাট কুরবানীর বিনিময়ে।"– আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ৩য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আল্লামা ইউসুফ আলী কৃত তাঁর 'The Holy Quran: Translation & Commentary'-তে এ আয়াতের অনুবাদ: 'And we ransomed him with a momentous sacrifice.' Saffat 37 : Ayat 107, P. 1206

এ আয়াতে 'momentous sacrifice' সম্পর্কে টীকায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্যে এই অনুবাদক-ভাষ্যকার ইমাম হুসাইন (রা.)-এর আত্মদানকে সর্বোচ্চ ভাবনায় উত্তীর্ণ করে বলেন– 'The adjective qualifying 'sacrifice' here, 'azim' (great, momentous) may be understood both in a literal and a figurative sense. In a literal sense it implies that a fine sheep or ram was substituted symbolically. The figurative sense is even more important. It was indeed a great and momentous occasion, when two men, with concerted will, 'ranged themselves in the ranks' of those to whom self-sacrifice in the service of God was the supreme thing in life.

This was a type of the service which Imam Husain performed, many ages later, in 60 A. H. as I have explained in a separate pamphlet.....'

৬. নজরুল কাব্য ও সংগীতে আহলে বাইত

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান (মরহুম) কাজী নজরুল ইসলামের মূল্যায়নে বলেন, '...নজরুল আমাদের জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক।... সাথে সাথে সাদী-হাফেজ- আত্তার-রুমী-জামী-নিজামী-সানাঈ-ফেরদৌসীর বাংলা সংস্করণ ও প্রতীক নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য সকল মহলের সাগ্রহ প্রচেষ্টা আরজ করছি।' তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বখ্যাত কালোত্তীর্ণ এই কবিদের 'বাংলা সংস্করণ ও প্রতীক নজরুল ইসলাম'। তাঁর সংগীত ও কবিতা থেকে আহলে বাইতের শানে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি :

"খয়বর জয়ী আলী হায়দার
জাগো জাগো আরবার।
দাও দুশমন দুর্গ-বিদারী
দু'ধারী জুলফিকার ॥
এস শেরে খোদা ফিরিয়া আরবে–
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে–
হায়দরী-হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
কর কর হুঁশিয়ার ॥

আল-বোর্জের চূড়া গুঁড়া করা
গোর্জ আবার হানো,
বেহেশতী সাকী, মৃত এ জাতিরে
আবে কওসর দানো ॥
আজি বিশ্ববিজয়ী জাতি যে বেহোঁশ,
দাও তারে নব কুওত ও জোশ;
এস নিরাশার মরুধূলি উড়ায়ে
দুলদুল আসওয়ার ॥"

...

"ওগো মা– ফাতেমা– ছুটে আয়,
তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দীনের শেষ বাতি নিভিয়া যায় মাগো
(বুঝি) আঁধার হ'ল মদিনা-পুরী ॥

কোথায় শেরে-খোদা; জুলফিকার কোথা
কবর ফেড়ে' এস কারবালা যেথা–
তোমার আওলাদ বিরাণ হ'ল আজি
নিখিল শোকে মরে ঝুরি' ॥"

কোথা আখেরী নবী, চুমা খেতে তুমি
যে গলে হোসেনের,
সহিছ কেমনে? সে গলে দুশমন
হানিছে শমসের;"

...

"খাতুনে-জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী-নন্দিনী।
মদিনা-বাসিনী পাপ-তাপ নাশিনী
উম্মত-তারিণী আনন্দিনী ॥
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরু-ছায়া;
মুক্তি লভিল মাগো এর শুভ পরশে
বিশ্বের যত নারী বন্দিনী ॥"

...

"নবী-নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রাণী,
যাঁর ত্যাগ, সেবা, স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর পানি,
যাঁর গুণগাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর-নারী আজো গায় ॥"

...

"মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা; ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায় ॥
কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহোঁশ হল কারবালায়।
বেহেশতে লুটিয়া কাঁদে আলী ও মা ফাতেমায় ॥"

...

"কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া
ঝরে হাজার বছর ধরে অশ্রু তারি শোকে হায় ॥"

...

"মনে পড়ে আসগরে আজ পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদৎ হোসেনের বক্ষে রয়ে ॥
এক হাতে বিবাহের কাঙন এক হাতে কাশেমের লাশ
বেহোঁশ খিমাতে সকিনা অসহ বেদনা স'য়ে ॥"

...

'শূন্য পিঠে কাঁদে দুলদুল হজরত হোসেন শহীদ,
আসমানে শোকের বারেষ, ঝরে আজি খুন হয়ে ॥"

...

"ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে
অঝোর নয়নে রে।
দু'হাতে তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলেন অমনি
পড়িল কি মনে রে॥"

...

নব জীবনের "ফোরাত"-কূলে গো কাঁদে "কারবালা" তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,
এরি মাঝে মোরা "আব্বাস" সম পানি আনি প্রাণ পণ করি।"
(তরুণের গান)

"বহিছে সাহারায় শোকের 'লু' হাওয়া
দুলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে।
নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন
ঘোরে অশ্রু শ্রাবণ-ধারা ঝরে সঘনে ॥"

...

ফাল্গুধারা-সম সেই কাঁদন-নদী
কুল-মুসলিম-চিতে বহে গো নিরবধি,
আসমান ও জমীন রহিবে যতদিন
সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে ॥"

লেখক: সাবেক সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও সাহিত্য সম্পাদক,
নিউ নেশন, ঢাকা

একটি স্বর্গীয় বিয়ে এবং বিয়ে বার্ষিকী উদ্‌যাপন

শাহনাজ আরফীন

আরবি যিলহজ মাসের প্রথম দিন মুসলমানদের জন্য অনাবিল আনন্দ আর উৎসবমুখর একটি দিন। এদিনে এ ধরাপৃষ্ঠে এমন দুজন স্বর্গীয় মানব ও মানবীর শুভ বিবাহ হয়েছিল যার খুশি আর আনন্দে মেতে উঠেছিলেন খোদ আসমানের ফেরেশতারাও।

হ্যাঁ, ঐতিহাসিক ওই বিয়ের বর ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) আর কনে ছিলেন নবীনন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা. আ.)। পবিত্র যিলহজ মাসের এক তারিখে রোজ শুক্রবার নবীনন্দিনী ফাতেমা যাহরার সাথে শেরে খোদা আলী (আ.)-এর ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন ও শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহান স্রষ্টা নিজ মনোনীত বান্দা রাসূলে পাক (সা.)-কে এ অভিনব ও স্বর্গীয় বিয়ের সাক্ষী হিসেবে স্থির করেন। এ ঐশী বিয়ের আনন্দ ও সুখময় স্মৃতি সূর্যের আলোকরশ্মির মতোই আলো বিকিরণ করবে ও প্রেরণা যোগাবে প্রতিটি খোদাপ্রেমী মানুষকে।

মা ফাতেমা ও আলী (আ.)-এর বিবাহ বার্ষিকী ইরানে 'বিয়ে দিবস' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। স্বর্গীয় এ দুজন মহামানবের প্রেম-প্রীতির অপূর্ব এ বন্ধনকে চির অম্লান রাখা এবং তাঁদের শুভ পরিণয়ের আদর্শ অনুসরণের জন্য এ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ সত্যিই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত ফাতেমা (সা.) আরবি ২০শে জমাদিউস সানী হযরত খাদিজাতুল কোবরার গৃহ আলোকিত করে এ ধরার বুকে আগমন করেন। জন্মের পর রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখেন 'ফাতেমা'। 'ফাতেমা' নামটির অর্থ হলো সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ মহীয়সী নারী বহু মানবীয় গুণের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে সিদ্দিকাহ বা সত্যবাদিনী, মুবারাকাহ বা বরকতময়ী, তাহেরাহ বা পবিত্রা, যাকিয়াহ বা পরিশুদ্ধতার অধিকারী, রাজীয়া বা সন্তুষ্ট, মার্জিয়া বা সন্তোষপ্রাপ্ত মুহাদ্দিসাহ বা হাদিস বর্ণনাকারী এবং যাহরা বা দীপ্তিময় উপাধিতে ডাকা হতো। এছাড়া তিনি উম্মুল হাসান, উম্মুল হুসাইন, উম্মুল মুহসিন, উম্মুল আয়েম্মা এবং উম্মে আবিহা নামেও পরিচিত ছিলেন। হযরত ফাতেমা ছিলেন রাসূলে খোদা (সা.)-এর অতি আদরের কন্যা। ফাতেমা সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) বলেন : 'ফাতেমা আমার দেহের অঙ্গ, চোখের জ্যোতি, অন্তরের ফল এবং আমার রুহস্বরূপ। সে হচ্ছে মানুষরূপী স্বর্গীয় হুর।'

অন্যদিকে, হযরত আলী (আ.) ছিলেন রাসূলে খোদার চাচা আবু তালিবের পুত্র। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই রজব তিনি পবিত্র কাবাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিনদিন পর বালকটির মা ফাতিমা বিনতে আসাদ তার নাম রাখেন আলী। চাচা আবু তালিবের দুর্দিনে রাসূল (সা.) ছোট্ট বালক আলীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। রাসূল খোদা যখন নবুওয়াত পান, তখন কিশোর আলীই তাঁর প্রতি প্রথম ইমান আনেন। শুধু তাই নয়, নবীজিকে তিনি সবসময় ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। তাঁর বীরত্ব, জ্ঞান-গরিমা, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও

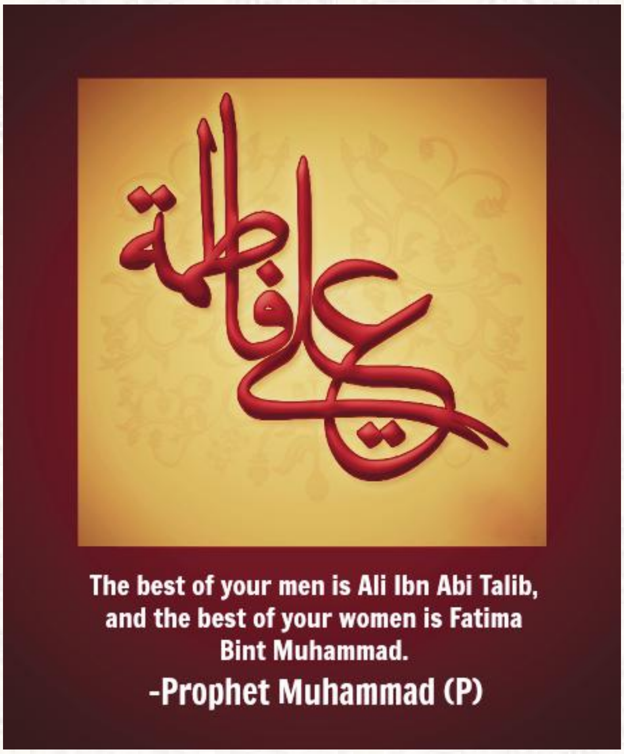

সাহসিকতায় রাসূল (সা.) ছিলেন মুগ্ধ। খোদ রাসূল (সা.) আলী সম্পর্কে বলেন : 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হচ্ছে তার দরজা।'

রাসূলে খোদা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার দুবছর পর অনেকেই তাঁর কাছে ফাতিমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তাঁদের মধ্যে আরবের বহু স্বনামনধন্য প্রথিতযশা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিলেন। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই রাসূলে খোদা (সা.) জানান যে, তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর ওহীর দিকনির্দেশনার প্রত্যাশা করছেন। প্রাচীন আরবে বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মোটা অংকের দেনমোহরকে নারীর জন্য সম্মানের মাপকাঠি এবং স্বামীর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.)-এর বিয়ের ঘটনা তো ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শকে তুলে ধরবে এবং সেই সাথে অন্ধকার ও জাহেলী যুগের রীতি-নীতি ও প্রথাগুলোর মূলোৎপাটন করে ইসলামি মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করবে। তাই বিশ্বনবী (সা.) সমাজের এসব বৈশিষ্ট্য ও মাপকাঠিকে অগ্রাহ্য করে প্রচলিত প্রথায় আঘাত হানেন। আরবের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে আওফ যখন ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং দেনমোহর হিসেবে মোটা অংকের অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করেন, রাসূলে খোদা (সা.) ভীষণ রাগান্বিত

হন।

যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) হযরত ফাতেমা (সা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন লজ্জায় তাঁর চেহারা মোবারক গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছিল। রাসূল (সা.) আলীর অবস্থা দেখে মুচকি হেসে বলেন : 'আমার কাছে কি কোনো কাজে এসেছ?' কিন্তু আলী (আ.) লজ্জা ও সংকোচের কারণে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারলেন না, বরং নীরব থাকলেন। মহানবী (সা.) আলীকে বলেন : 'ফাতেমার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ।' আলী (আ.) বলেন, 'জী, এ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।' আলী (আ.)-এর কোনো ধনসম্পদ ছিল না এবং আরবের জাহেলী প্রথানুযায়ী ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না। তারপরও মহানবী এ প্রস্তাবে খুব খুশি হলেন। তিনি বলেন : 'হে আলী! তোমার আগেও অনেকে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু যখনই আমি তাদের প্রস্তাব ফাতেমার কাছে উপস্থাপন করেছি সে না-সূচক জবাব দিয়েছে। এখন তোমার বিষয়টিও তার কাছে তুলে ধরব।'

হযরত আলীর প্রস্তাব নিয়ে মহানবী কন্যা ফাতেমার কাছে এলেন। তিনি আলীর অসাধারণ চারিত্রিক গুণ ও মর্যাদা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন : 'মা, তুমি কি আলীকে বিয়ে করতে রাজি আছ? আল্লাহ আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।' হযরত ফাতেমা একথা শুনে খুশি হলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। কেবল মাথা নিচু করে সম্মতি জানালেন। মহানবী মেয়ের সম্মতি জানতে পেরে খুশিতে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন।

এটা সত্য যে, এ বিবাহটি ছিল একটি ঐশী সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে সহধর্মী নির্বাচনে নারীদের মতামতের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য রাসূল (সা.) হযরত ফাতেমার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা পদক্ষেপ নেননি।

এরপর দ্বিতীয় হিজরির পহেলা যিলহজ, শুক্রবার হযরত আলীর সাথে হযরত ফাতেমার শুভ বিবাহের দিন ধার্য করা হয়। এ বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু আনসার ও মুহাজির উপস্থিত ছিলেন। আলীর সাথে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়ায় মুহাজিরদের অনেকেই এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন : 'আল্লাহর আদেশে আমি ফাতেমার সাথে আলীর বিয়ে দিচ্ছি।' এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এমন কিছু কি আছে যা দ্বারা তোমার স্ত্রীর দেনমোহর প্রদান করবে?' আলী (আ.) বলেন : 'আপনি আমার জীবন-যাপন সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন। আমার নিকট একটি তরবারি, একটি ঢাল ও একটি উট ছাড়া আর কিছুই নেই।'

রাসূল (সা.) বলেন : 'ঠিক আছে, ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সময় তোমার তরবারি প্রয়োজন হবে। আর খেজুর বাগানে পানি দেবার জন্য এবং সফরের সময় তোমার উটের প্রয়োজন হবে। অতএব, অবশিষ্ট থাকে শুধু ঢালটি, আর তা দিয়েই তোমার স্ত্রীর দেনমোহর প্রদান করবে। আমি আমার কন্যা ফাতেমাকে কেবল উক্ত ঢালের বিনিময়ে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। হে আলী, তুমি কি এতে রাজি আছ?' হযরত আলী সম্মতি জানিয়ে বললেন : 'জী, আমি রাজি।'

তখন নবীজী দুহাত তুলে তাঁদের জন্য এবং তাঁদের অনাগত বংশধরদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

এ দুজন মহামানবের বিয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সাদামাটা। তাই হযরত উম্মে আইমান এসে মহানবীর কাছে দুঃখ করে বললেন : 'সেদিনও তো আনসারদের এক মেয়ের বিয়ে হলো। সে অনুষ্ঠানে কত জাঁকজমক ও আনন্দ ফুর্তি হলো! অথচ বিশ্ববাসীর নেতা মহানবীর মেয়ের বিয়ে কিনা এত সাধারণ ও সাদাসিধেভাবে হচ্ছে!' উম্মে আইমানের কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন : 'এ বিয়ের সাথে পৃথিবীর কোনো বিয়ের তুলনা হয় না। পৃথিবীতে এ বিয়ের কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান না হলেও আল্লাহর আদেশে আসমানে এ বিয়ে উপলক্ষে ব্যাপক উৎসব হচ্ছে।

বেহেশতকে অপূর্ব সাজে সাজানো হয়েছে। ফেরেশতারা, হুর-গেলমান সবাই আনন্দ করছে। বেহেশতের গাছপালা থেকে মণি-মুক্তা ঝরছে!' একথা শুনে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার স্বর্গীয় বিয়ের শিক্ষাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. বিয়ের ক্ষেত্রে সমাজের রীতিনীতি ও মানুষের মতামতের চেয়ে স্রষ্টার মতামত ও সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া।

২. সঠিক ও উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন।

৩. বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাহুল্য ও অপচয় থেকে দূরে থাকা।

৪. বিয়ের মোহরানা যথাসম্ভব সহনীয় ও সাধ্যের মধ্যে নির্ধারণ করা, নারীদের মোহরানা উচ্চ হারে না ধরা।

৫. বিয়ের আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো সহজ ও স্বাভাবিক রাখা।

৬. পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে খোদাভীতি, সদাচরণ ও মানবীয় গুণাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানমালায় পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠান যেন মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিয়েতে কে কত বেশি জমকালো আয়োজন করতে পারে, অর্থ ব্যয় করতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা চলে সবার মধ্যে। বিয়ের অনুষ্ঠান লৌকিকতা এবং নিছক আনন্দ-উল্লাসের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর অপর দিকে বিয়ের শর্তাবলি কঠিন ও ব্যয়বহুল হবার কারণে বিয়ের ব্যাপারে যুবক-যুবতীদের অনীহা তৈরি হচ্ছে এবং নানা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ক্রমশ বাড়ছে।

অথচ বিবাহ একটি শুভ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা পালনের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা হয়। বিয়ে হচ্ছে রাসূলে খোদা (সা.)-এর পবিত্র একটি সুন্নত। মানবতার ধর্ম ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে সুন্দর ও পুতঃপবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশালীনতার অভিশাপ থেকে সুরক্ষা পেতেই ইসলাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে জোর তাগিদ প্রদান করেছে। কাজেই বিয়ের মতো শুভ ও পবিত্র একটি ঐশী বিধানকে নির্মল, সুন্দর ও সার্থক করার জন্য নবী করিম (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ একান্ত জরুরি। বিশ্বনবী (সা.) ঐশী নির্দেশে এবং নিজ তত্ত্বাবধানে কন্যা ফাতেমার সাথে আলীর বিয়ে দিয়েছেন। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে উত্তম আদর্শ আর কি হতে পারে? তাই মা ফাতেমা ও হযরত আলীর বিবাহ বার্ষিকীকে 'বিয়ে দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন সত্যিই প্রশংসনীয়। যাঁরা নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে ঐশী দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত করতে চান এবং নিজেদের পারিবারিক জীবনকে বরকতময় ও স্বর্গীয় সুষমা দিয়ে ভরে তুলতে চান তাঁদের জন্য ফাতেমা ও আলীর বিয়ে বার্ষিকী হতে পারে সর্বোত্তম ও শুভ দিন।

ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের গুরুত্ব

(৫৬ পাতার পর)

প্রশ্ন হলো, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের শিকড় কোথায়? মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়ে। তবে বাংলায় ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন তারও আগে। তখনকার দুনিয়ার সকল বাণিজ্য ছিল সাগর পথে। সমুদ্র বাণিজ্যে তখন একক রাজত্ব ছিল আরব বণিকদের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য সফরে যাত্রাবিরতির ঐতিহাসিক স্থান ছিল চট্টগ্রাম বন্দর। সেখান থেকেই চট্টগ্রাম ও আরাকানে ইসলামের বিস্তার হয়। চট্টগ্রাম 'ইসলামাবাদ' নামে আখ্যায়িত হওয়ার প্রেক্ষাপটও তাই। আরব বণিকদের মতো বাংলাদেশে ফারসিভাষী সুফি-দরবেশদের আগমন হয়েছিল ব্যাপকভাবে। আর বখতিয়ার খিলজির সামরিক বিজয়ের পর এই ভূখণ্ড পুরোপুরি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে হালাকু খাঁ (১২৫৬-১২৬৫ খ্রি.) বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর ফলে দলে দলে আলেম, সুফি-দরবেশ ও শাসকশ্রেণির লোকজন বাংলায় আগমন করেন।

ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে অফিস-আদালত ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফারসি। শাসকশ্রেণি আফগান বা তুর্কি বংশোদ্ভূত হলেও তাঁরা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বরাবর ফারসির পরিচর্যা করেন। এ কারণে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ বা তারও আগে থেকে এই ভূখণ্ডে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সবকিছু লিপিবদ্ধ হয় ফারসি ভাষায়। এই অবস্থা অব্যাহত থাকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিকরা নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। কিন্তু দাফতরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু করতে ইংরেজদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় একশ বছর অর্থাৎ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার মানে ছয়-সাতশ বছর পর্যন্ত এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফারসি। বস্তুত ঐতিহাসিক সত্য হলো, বাঙালি বা বাংলাদেশী বলতে যাদের বুঝায় এই ভূখণ্ডের সেই ভূমিপুত্র মুসলমানদের জাতীয় চেতনার শিকড় সন্ধান করতে হলে ফারসির মধ্যেই খুঁজতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে যতই চিন্তা করা হবে ততই আমাদের জাতীয় জীবনে ফারসি চর্চার গুরুত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদি বলেন, ফারসি চর্চা করে বৈষয়িক লাভ কী হবে, তাহলে বলব, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইতিহাস বিভাগ আছে, দর্শন চর্চা হয়, তার প্রয়োজন কেন? বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সাহিত্য চর্চারও প্রয়োজন কেন হবে? আমরা জানি, মানুষ কোনো উৎপাদন যন্ত্র বা রোবট কিংবা অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার নয়। তার মন আছে, মননশীলতা আছে। ঐতিহ্যবোধ আছে। নৈতিক চেতনা, যুক্তিবাদ ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের সঠিক বেঠিক পথ নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের দাবিতেই জাতীয় জীবনে ফারসির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কথা উঠলে জাতীয় জাদুঘর বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের বিষয়টি সামনে আসে। অথচ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কতক অমূল্য পাণ্ডুলিপি আছে। এগুলোর প্রতি অযত্ন অবহেলার শেষ নেই। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার মতো আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ঢাকার নজরুল কলেজ, চট্টগ্রামের মহসিন কলেজ যেগুলো অতীতে মাদ্রাসা ছিল, নিউস্কীমের খপ্পড়ে পড়ে কলেজে পরিণত হয়েছে, সেখানে পচনশীল প্রাচীন আরবি ফারসি কিতাবপত্র ও পাণ্ডুলিপির খোঁজ খবর রাখার কেউ গরজ করে না। আমরা নিজেদের প্রতি এমনই উদাসীন!

এসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে এখনো অনেক পরিবার আছে যারা পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসেবে বাড়িতে ফারসি-আরবি কিতাব বা পাণ্ডুলিপি বুকে আগলে রেখেছেন। অথচ সেগুলো যথাযথ ব্যবহার করেন না, যত্ন নেন না। এই দিকটি চিন্তা করে আনজুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর পক্ষ হতে একটি আবেদন পেশ করা হয়েছে। এ আবেদনে সকলে ইতিবাচক সাড়া দেবেন বলে আশা করছি।

মানবাধিকার : ইসলামি ও পাশ্চাত্যের নিরিখ

মুজতাহিদ ফারুকী

মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে অধিকার কাকে বলে তা বুঝে নিতে হবে। বুঝতে হবে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য। এরপর আসবে মানবাধিকার ও ইসলামে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে 'অধিকার' বলতে কোনো কিছুর উপর একজন মানুষের নৈতিক বা আইনগত দাবি বোঝায়। একজন মানুষ জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খাবারের চাহিদা জন্মায়। এই দাবি বা চাহিদা তার বাবা-মার কাছে, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে এবং রাষ্ট্রের কাছে। এই দাবিটি একেবারেই প্রাথমিক। এটা তার লাগবেই। এমনই আরও কিছু দাবি তার থাকে। সে কোথায় থাকবে, কী পরবে, কী শিখবে ইত্যাদি যৌক্তিক বিষয়গুলো তার পরিবার যেমন মেনে নেয়, তেমনই সমাজ ও রাষ্ট্রও স্বীকার করে। সুতরাং মৌলিক অধিকার হলো নাগরিকদের প্রাথমিক অধিকার যা সংবিধানে লিখিত। এটি হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা, যা রাষ্ট্র নিশ্চিত করে।

অন্যদিকে মানবাধিকার হলো সেই সব অধিকার যা সব মানুষের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। যেমন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে থাকুক না কেন, তার মর্যাদা হবে অন্য যে কোনও মানুষের সমান। ওই মানুষটি যে ধর্মের, যে জাতির, যে বর্ণের বা লিঙ্গের হোক না কেন তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উন্নত জাতির একজন মানুষেরই সমান মর্যাদা, সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এটাই মানবাধিকার এবং এটিও মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। তবে এই অধিকার নিশ্চিত করে বিশ্বের সব দেশের অংশীদারিত্বে গড়ে ওঠা সবার অভিন্ন প্লাটফর্ম জাতিসংঘ। বুঝতে হবে, মৌলিক অধিকার দেশে দেশে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নীতিমালা যা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য সম মর্যাদার নিশ্চয়তা দেয়। এটি মানব সমাজের সব সদস্যের জন্য সর্বজনীন, সহজাত, হস্তান্তরের অযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয়। বলা হয়, মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এমন এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। এ চর্চার মধ্য দিয়ে অন্যের মানবাধিকার নিশ্চিত হলেই বিশ্বশান্তি নিশ্চিত ও মানবতার কল্যাণ হওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য, সদস্য দেশগুলোর নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ কোনও দেশকে নির্দেশ দিতে, এমনকি চাপ প্রয়োগও করতে পারে।

সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের বিষয়টি নানা কারণে বহুল আলোচিত। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ঘোষিত হয় এবং এ সনদ কার্যকর করার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে যে ৩০টি ধারা সংযোজিত রয়েছে তাতে মানুষের মৌলিক ও আইনগত অধিকার সংরক্ষিত থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং দেখা গেছে, বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ওই নীতিমালার বাস্তবায়ন ভিন্নতর হচ্ছে। ভিন্ন দেশ বা জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় জনসমষ্টির ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। আর এটি করছে কারা? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে পাশ্চাত্যের যেসব দেশ বিশ্বের মোড়ল হয়ে বসেছে তারাই। তারা নিজেদের স্বার্থে অর্থাৎ রাজনৈতিক সুবিধা লাভের হাতিয়ার হিসাবে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি সামনে আনছে বা ক্ষেত্রবিশেষে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। তার অর্থ হলো বিশ্বের সব মানুষ, সব দেশ, সব ধর্ম, সব জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার

সমভাবে রক্ষা করা হচ্ছে না বা করতে দেওয়া হচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই।

এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে একজন মুসলমানের মনে আসবে কীভাবে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চলে আসছে গত ৭০ বছর ধরে। তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, সামান্য নিন্দাটুকুও জানাতে পারেনি জাতিসংঘ। বরং কোনো কোনো পরাশক্তি বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে দেশটিকে তার মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে চলেছে। ধর্ম পালনের অধিকার মানবাধিকার সনদে অন্যতম অধিকার হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু এক্ষেত্রেও বৈষম্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদকে যেন নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর বলে গণ্য করা হচ্ছে। যেমন আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের মানবধিকার শত শত বছর ধরে পদে পদে লঙ্ঘিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কৃষ্ণাঙ্গদেরও জীবনের মূল্য–আমেরিকার সমাজে সেটিই অস্বীকৃত। আর সেজন্যেই এই ২০২০ সালে এসেও তাদেরকে 'ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটারস' নামে আন্দোলন সংগ্রামে রাজপথে নামতে হয়। মানুষ হিসাবে ন্যূনতম অধিকার লাভের জন্য চিৎকার করে গলায় রক্ত তুলতে হয়। এখন মোটামুটি সবাই জানেন যে, পশ্চিমা দুনিয়ার অন্যায়, একদেশদর্শী ও স্বার্থবাদী আচরণের কারণেই বিশ্বে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প মানবাদিকার সনদের চিন্তা ভাবনা জরুরি হয়ে উঠে।

সেই ভাবনা-চিন্তারই বাস্তব প্রতিফলন হলো ইসলামি মানবাধিকারের সনদ। ১৯৯০ সালের ৫ আগস্ট ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণা পাস হয়। এরপর থেকেই প্রতি বছর ৫ আগস্ট মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি মানবাধিকার ও মানবীয় মর্যাদা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বাইরের (অ-পশ্চিমা) দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিতে ব্যর্থতার জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (ইউডিএইচআর) সমালোচনা করেছিল।

মুসলিম দেশগুলোর এই উপলব্ধি থেকেই জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও নির্দিষ্ট দিবস থাকার পরও ইসলামি মানবাধিকার দিবস পালনের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এইসব সমালোচনা ও উপলব্ধির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ওআইসির সম্মেলনে মানবাধিকারের কায়রো ঘোষণা (সিডিএইচআরআই) প্রণয়ন ও ঘোষণা করা হয় যা পরে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো অনুস্বাক্ষর করে।

এ পর্যায়ে আমরা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সঙ্গে ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণার পার্থক্যটা এক নজরে দেখে নিতে পারি।

জাতিসংঘে নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ব্যবহার করে পাশ্চাত্যের দেশগুলো সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ৩০ ধারাবিশিষ্ট জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার মূল ভিত্তি হলো পশ্চিমা লিবারেলিজম বা উদার নৈতিকতাবাদ। এ ঘোষণায় মুসলমানসহ অনেক জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি ও বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণার বেশ কিছু দিক গ্রহণযোগ্য হলেও এর অনেক ধারাই ইসলামি বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

অন্যদিকে ইসলামে মানবাধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরভাবে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। এর অর্থ হলো, কেউ যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে তার ঈমান রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যায়। ঈমানদারি ঠিক রাখতে হলে মানবাধিকারের নীতি সমুন্নত রাখতে হবে। সুতরাং ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা নিছক একটি ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রতিপালন করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় যে বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়েছে, ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণার ২৫টি ধারায় সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। মানবীয় মর্যাদা, নীতি-নৈতিকতা ও মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার বিষয়গুলো ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। এতে গোটা মানবজাতিকে একটি পরিবারের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সব মানুষই আল্লাহর দাস ও আদমের সন্তান। তাই

ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণার ২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার মতামত প্রকাশের ব্যাপারে স্বাধীন, তবে তা ধর্মবিরোধী হওয়া চলবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বাক-স্বাধীনতা লাগামহীন নয়। বাক-স্বাধীনতার নামে অন্যদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও পবিত্র বিষয়গুলোর অবমাননা করার কোনো অধিকার কারো নেই। দুঃখজনকভাবে পশ্চিমা সরকার ও গণমাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে এবং তারা এ পর্যন্ত ইসলামের পবিত্র বিষয়গুলোর যারপরনাই অবমাননা করেছে। তাই ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় পবিত্র বিষয় এবং নবী-রাসূলদের মর্যাদার প্রতি আঘাত কিংবা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ও সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী বা ঐশী বিশ্বাসের প্রতি অবমাননাকর যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিষিদ্ধ।'

ধর্ম,বর্ণ, গোত্র, জাতি ও সমাজের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। সেই মানুষই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে যে সবচেয়ে বেশি ন্যায়নিষ্ঠ বা তাকওয়াসম্পন্ন। ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটিই হলো মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তি। ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিব বিষয়গুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম মানবাধিকারের সীমা এত প্রশস্ত করেছে যে, মানুষের পুরো জীবন এর আওতায় পড়ে। পিতা-মাতার হক, সন্তানের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, নারীর অধিকার, বন্ধু-বান্ধবের হক, শ্রমিক-মালিক এবং শাসক ও জনগণের হক, সরকারের হক, শ্রমজীবী মানুষদের হক, দুর্বল ও অসহায়দের হক, এতিম-মিসকিনের হক, সাধারণ মুসলমানের হক, সাধারণ মানুষের হক ইত্যাদি ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় বিষয় ইসলামের মানবাধিকারের অনুষঙ্গ।

ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণার ষষ্ঠ ধারায় নারী-পুরুষের সাম্যের কথা স্থান পেয়েছে। নারী ও পুরুষের যেমন আলাদা আলাদা কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি আলাদা আলাদা কিছু অধিকারও রয়েছে। নাগরিক অধিকার ছাড়াও তাদের রয়েছে স্বাধীনভাবে সম্পদ অর্জনের অধিকার। নারী ও পুরুষের শারীরিক ও চাহিদাগত পার্থক্যের কারণে তাদের দায়িত্ব ও অধিকারেও কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে ইসলাম মনে করে, কিন্তু এসব পার্থক্যের অর্থ বৈষম্য নয়। সামাজিক অগ্রগতি ও সুষ্ঠুতার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় ঐশী নির্দেশনার (কুরআন ও সুন্নাহ) প্রেক্ষিতেই এটা করা হয়েছে।

ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ন্যায্য অধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে অভিহিত করে। ইসলামি মানবাধিকার ঘোষণায় স্বৈরাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারকেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম অমুসলিমদেরকে যথাযথ নিরাপত্তা ও অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মান-সম্মানের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকারসহ সব রকমের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

পাশ্চাত্য ও ইসলামের মানবাধিকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার পর এখন আমরা বাস্তব উপলব্ধির সঙ্গে বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারি। বিষয়টি আমরা দেখতে পারি ইরানি চিন্তাবিদ হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ জাভাদ হুজ্জাতি কিরমানির চিন্তাধারার আলোকে। তাঁর 'ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের ধারণায় মিল-অমিল' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে একটি সুনিশ্চিত নির্দেশনা পাওয়া যায় যা আমাদের বিবেচনায় অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবানুগ।

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ।' পবিত্র কুরআনের এই বাণী উদ্ধৃত করে কিরমানি বলছেন, সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার মুখবন্ধে প্রতিটি মানুষের সহজাত গুণাবলির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয় যে, এই ঘোষণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত অথবা অন্ততপক্ষে উভয়টিই পরম কার্যকারণ এবং মানবিক প্রজ্ঞার ধারণার সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ। উভয়ের মধ্যে

সবচেয়ে বড় পার্থক্য শুধু এটুকু যে, একটির উদ্ভব সরাসরি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ থেকে আরেকটি কিছু মধ্যবর্তী উপাদানের ভেতর দিয়ে প্রত্যাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইসলামে মানবাধিকার বা ইনসানিয়াত এবং পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের ঘোষণা পাশাপাশি রেখে বিচার বিবেচনা করার সুযোগ আছে। সেটা যে কেউ করতে পারেন। তবে আমরা এ বিষয়ে ইরানি স্কলার হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ জাভাদ কিরমানির দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য মনে করি। ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশটি বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের পণ্ডিতদের নিয়ে আন্তঃধর্ম সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। কিরমানির মানবাধিকার বিষয়ক এক প্রবন্ধে সেই পরিপ্রেক্ষিতটি ধরা পড়ে। তিনি সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা এবং ইসলামি মানবাধিকারের তুলনা করতে গিয়ে বলছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় পরিবারকে একক সত্তা হিসাবে গ্রহণের বিষয়টি ওই সময়ের জনমানস এবং একটি আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতার ভিত্তিতেই তার ঐক্যের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আমরা ইসলামি ও পাশ্চাত্যের মানবাধিকার ব্যবস্থার মধ্যে সাজুয্য খুঁজে পাই। ইসলামেও পরিবারকে অভিন্ন লাভ-ক্ষতির শরিক একটি একক সত্তা হিসাবে দেখা হয়। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের ধারণার আরেকটি অভিন্ন উপাদান হলো মানুষের প্রকৃতিগত মূল্য ও তার প্রতি শ্রদ্ধা।'

জাভাদ কিরমানি উভয় ঘোষণার মধ্যে যেসব সামঞ্জস্য রয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করে বলেন, 'স্বাধীনতা বলতে আমরা সাধারণভাবে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত স্বাধীনতাই বুঝি যেখানে মানুষকে জন্মগতভাবে স্বাধীন বলা হয়েছে এবং সব ধরনের দাসত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ও নিরাপত্তার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়েছে।... মানুষের দায়িত্ববোধের জন্ম হয় তার স্বাধীনতার চেতনা থেকে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই মুক্ত সত্তা। বিজ্ঞ বলেই সে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সংযম রক্ষা করে চলার বিষয়টিকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক বলে মনে করে। সংযমের এই যৌক্তিক প্রয়াস আরও বিশুদ্ধ ও প্রকৃত রূপ লাভ করে অধ্যাত্মবাদ ও ঐশী প্রত্যাদেশের আলোকধারায়।'

ইসলামি ও পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকলে সেটা আছে স্বাধীনতার মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। সেটা স্বাধীনতার যৌক্তিকতা ও মৌলিক ভিত্তির কোনও ব্যত্যয় ঘটায় না।

অন্য কথায়, মানবাধিকারের উভয় ধারণাই মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার ওপর কিছু সীমারেখা টেনে দেয়। খোদায়ী বিধানে যৌন স্বাধীনতার ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন নিয়ন্ত্রণ অনেক কম। তার পরও পাশ্চাত্যের ভোগবাদী আদর্শেও যৌন স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে, যেমন ধর্ষণ এবং প্রকাশ্য যৌনাচার নিষিদ্ধ। তার মানে হলো, সবচেয়ে মুক্ত সমাজের ক্ষেত্রেও মানুষের যুক্তিশীলতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি, সেখানেও খুব সামান্য হলেও স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

জাভাদ কিরমানি তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বস্তুতপক্ষে ন্যায়বিচার বলবৎ করা এবং অবিচার দূর করার আকাঙ্ক্ষার উদাহরণ যা ইসলামি ও পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের ধারণায় খুবই জোরালো এবং সংহতরূপে রয়েছে, সেটি উভয়ের মধ্যে আরেকটি সংযোগসূত্র। প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচারের ধারণাই গোটা বিশ্বকে স্থিতিশীল করেছে। তিনি উভয় ঘোষণার মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যগুলোও চিহ্নিত করেন। তবে আহ্বান জানান, সবাইকে নিজ নিজ আদর্শে অবিচল থেকেও একটি সমঝোতার জায়গায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো যায় কিনা সেই বিষয়ে প্রয়াসী হওয়ার। কারণ, বিশ্ববাসী এখনও বিভিন্ন ধর্ম তথা মানবজাতির বিভিন্ন আদর্শের কাছেই শান্তির প্রত্যাশা করে।

প্রেসিডেন্ট ড. রায়িসির কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবন

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি গত ১৮ই জুন (২০২১) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সর্বোচ্চ ভোট লাভ করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তেরোতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংবিধান অনুযায়ী রাহ্‌বার হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী কর্তৃক তাঁকে মনোনয়নপত্র প্রদানের পর তিনি মজলিসে শূরায়ে ইসলামি (পার্লামেন্ট)-এর অধিবেশনে শপথ গ্রহণের পর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হাসান রুহানির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্বীয় দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন এবং এক ব্যক্তি পর পর দুই বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন, অবশ্য এরপর অন্তত এক মেয়াদের বিরতির পর তিনি পুনরায় প্রার্থী হতে পারেন। হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন ইবরাহীম রায়িসি প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদের হিসেবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তেরোতম প্রেসিডেন্ট এবং এ পদে নির্বাচিত অষ্টম ব্যক্তি।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবুল হাসান বানী সাদ্‌র; তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করায় মজলিসে শূরায়ে ইসলামি তাঁকে অনাস্থা প্রদান করলে সংবিধান প্রদত্ত এখতিয়ার বলে ইসলামি বিপ্লবের নেতা ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রথম রাহ্‌বার হযরত ইমাম খোমেইনী (রা.) তাঁকে অপসারণ করেন। এরপর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মোহাম্মাদ আলী রাজাই; তিনি ইসলামি বিপ্লবের দুশমনদের দ্বারা সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে শহীদ হন। এরপর তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বর্তমান রাহ্‌বার হযরত আয়াতুল্লাহ্‌ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী; তিনি পর পর দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইমাম খোমেইনী (র.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ কর্তৃক প্রার্থিতাবিহীন পদ্ধতিতে রাহ্‌বার হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর আয়াতুল্লাহ আলী আকবার হাশেমী রাফসানজানী, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ খাতামী, ড. মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ও হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হাসান রুহানি প্রত্যেকে পর পর দুই মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অতঃপর হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন রায়িসি এ পদে নির্বাচিত হলেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন রায়িসি নির্বাচনের প্রথম দফায়ই সর্বোচ্চ ভোট লাভ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন; তিনি মোট এক কোটি আশি লাখ ভোট লাভ করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ছিলেন মোহসেন রেযায়ী, আবদুন নাসের হিম্মাতী ও আমীর হোসেন ক্বাযীযাদেহ। ড. রায়িসি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং এক কোটি ষাট লাখ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ড. রায়িসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী হবার পর পরই তাঁর তিন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে অভিনন্দন জানান।

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন রায়িসি অত্যন্ত কর্মবহুল ও বর্ণাঢ্য অতীতের অধিকারী। তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তেরোতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দেশের বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন

সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি ১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ইরানের অন্যতম ধর্মীয় নগরী মাশহাদ শহরের নোওগ্বন মহল্লায় এক দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন হোসেইনী সাইয়্যেদ এবং উভয়ই হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর পুত্র শহীদ হযরত যায়েদ (র.)-এর বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন মাশহাদের সুপরিচিত আলেমগণের অন্যতম। জনাব রায়িসির

সংগ্রামী জীবন

সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি কোমের মাদ্রাসায়ে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজারদী-তে অধ্যয়নকালে তখনকার শাহ্পন্থী পত্রিকা 'দৈনিক এত্তেলাআত'-এ হযরত ইমাম খোমেইনীর প্রতি অবমাননাকর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সারা ইরানে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ গণবিক্ষোভের শুরুর দিকেই মাদ্রাসায়ে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজারদী-তে একের পর এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং ড. রায়িসি এসব সভায় ও গণবিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট বিপ্লবী গ্রুপ গঠিত হয় এবং রায়িসিও এ ধরনের একটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন; তিনি এ সময় প্রধানত কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বা নির্বাসিত আলেমগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন।

ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালনের উপযোগী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের প্রকট অভাব লক্ষ্য করে শহীদ ড. আয়াতুল্লাহ বেহেশতী এ অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে জনশক্তি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি কোমের দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্র থেকে সত্তর জন বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাছাই করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; রায়িসি এই সত্তর জন ছাত্রের একজন ছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের বেশির ভাগ ক্লাসই তেহরানের মাদ্রাসায়ে 'আলীয়ে মোতাহহারী-তে অনুষ্ঠিত হতো। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে শহীদ আয়াতুল্লাহ বেহেশতী, বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আয়াতুল্লাহ মুসাভী আরদেবিলী (যিনি পরে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান মনোনীত হন) প্রমুখ শিক্ষাদান করেন।

এরপর 'মসজিদে সোলায়মান' শহরে মার্ক্সবাদী বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ও এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সেখানে দ্বীনী সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালানোর লক্ষ্যে ড. রায়িসি একদল দ্বীনী শিক্ষার্থীর সাথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সেখানে গমন করেন। মসজিদে সোলায়মান শহর থেকে কোমে ফিরে আসার পর তিনি শাহ্রূদ শহরে গমন করেন এবং সেখানে একটি রাজনৈতিক ও চৈন্তিক শিক্ষামূলক ফোরাম গঠন করেন। তিনি স্বয়ং কিছুদিন সেটি পরিচালনা করেন।

পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।

সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি মাশহাদে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশুনা শেষ করার পর দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য পর পর এ শহরেরই দু'টি দ্বীনী মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি তাঁর দ্বীনী শিক্ষা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ইরানের অন্যতম ধর্মীয় নগরী কোমে চলে যান এবং সেখানকার মাদ্রাসায়ে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজারদী-তে ভর্তি হন। এ সময় তিনি হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর ভাই হযরত আয়াতুল্লাহ্ পাসান্দিদে-র মাদ্রাসায়ও পড়াশুনা করেন।

সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি কোমে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সেখানকার বিভিন্ন সুপরিচিত মুজতাহিদ আলেমের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন আয়াতুল্লাহ মিশকীনী, আয়াতুল্লাহ খায আলী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মোরতাযা মোতাহহারী, আয়াতুল্লাহ মার্'আশী শূশ্তারী, আয়াতুল্লাহ হাশেমী শাহ্রূদী, আয়াতুল্লাহ্ মুজতাবা তেহরানী ও বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর ন্যায় মশহুর মুজতাহিদ ব্যক্তিত্বগণ।

ড. রায়িসি ইজতিহাদী ধারার দ্বীনী শিক্ষা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাও অব্যাহত রাখেন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন; এ সময় তিনি ارث بلا وارث (ওয়ারিসবিহীন মীরাছ) শীর্ষক একটি থিসিস রচনা করেন। এরপর তিনি ২০০১ সালে তেহরানের মাদ্রাসায়ে 'আলীয়ে শাহীদ মোতাহহারীতে ডক্টরেট করার জন্য অনুমতি লাভ করেন এবং تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق (ফিকাহ্ ও আইনে মূলনীতি ও বাহ্যিক তাৎপর্যের সাংঘর্ষিকতা) শিরোনামে থিসিস-এর জন্য ডক্টরেট লাভ করেন।

বিচার বিভাগীয় কর্মজীবন

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি শিক্ষাজীবন অব্যাহত থাকা অবস্থায়ই এর পাশাপাশি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং এ জন্য বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকে বেছে নেন। তিনি ১৯৮০ সালে ২০ বছর বয়সে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি তেহরানের পার্শ্ববর্তী জিলা শহর কারাজ-এ সহকারি প্রসিকিউটর পদে নিয়োজিত হন। কিন্তু তাঁর এ দায়িত্ব লাভের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় লাভ করে ইসলামি বিপ্লবের প্রসিকিউটর জেনারেল শহীদ আয়াতুল্লাহ্ কুদ্দুসী তাঁকে কারাজের প্রসিকিউটর নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি হামেদান প্রদেশের প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে তিনি তেহরানে ইসলামি বিপ্লবের প্রসিকিউটরের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

ড. রায়িসি তেহরানে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই হযরত ইমাম (র.) রাহ্বার হিসেবে সাংবিধানিক এখতিয়ার বলে ১৯৮৮ সালে ড. রায়িসিকে বিচার বিভাগের কাঠামোর বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে লোরেস্তান, কেরমানশাহ্ ও সেমনানসহ দেশের কয়েকটি প্রদেশের বিচার বিষয়ক সমস্যাবলি তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর হযরত ইমাম (র.) কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নথির বিচারিক ফয়সালার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেন।

১৯৮৯ সালে ইমাম খোমেইনীর ইন্তেকালের পর হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী রাহ্বার নির্বাচিত হন। এ সময় বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ ইয়াযদী; তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম রায়িসিকে তেহরানের প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। ড. রায়িসি ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি জাতীয় তদন্ত সংস্থার প্রধান পদে নিয়োজিত হন এবং ২০০৪ সাল পর্যন্ত দশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি বিচার বিভাগের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ২০১৪ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রসিকিউটর জেনারেল পদে দায়িত্ব লাভ করেন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুই বছর এ দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর উপরিউক্ত দায়িত্বসমূহের পাশাপাশি অতিরিক্ত বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে রাহ্বার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নির্দেশে তিনি ২০১২ সাল থেকে ওলামা সংক্রান্ত বিশেষ প্রসিকিউটর জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এছাড়া ধর্মীয় শহর মাশ্হাদের ওয়াকফ্ সংস্থা 'অস্তানে কুদসে রাযাভী'র মুতাওয়াল্লী আয়াতুল্লাহ্ ওয়া'এযীর ইন্তেকালের পর ২০১৪ সালের ৮ই মার্চ রাহ্বারের নির্দেশে ড. রায়িসি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০১৭ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত তিন বছর এ দায়িত্ব পালন করেন।

রাহ্বার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী ২০১৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান নিয়োগ করেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে শপথ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

দ্বীনী জ্ঞান বিস্তারে তৎপরতা

একজন মুজতাহিদ আলেম হিসেবে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসি বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন দ্বীনী 'ইল্মের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান বিস্তারের কাজ করেছেন। তিনি অস্তানে কুদসে রাযাভীর মোতাওয়াল্লী হিসেবে মাদ্রাসায়ে নাওয়াব্-এ ফিকাহ্শাস্ত্রের ওপর দার্সে খারেজ প্রদান করতেন। এছাড়াও তিনি তেহরানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত বিচার বিষয়ক ফিকাহ্র কাওয়া'এদ ও অর্থনৈতিক ফিকাহ্র কাওয়া'এদ্ সম্পর্কে স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি একই সময় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতেন; তিনি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন তার মধ্যে ইমাম সাদেক (আ.) বিশ্ববিদ্যালয় ও শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম।

এছাড়া ড. রায়িসি আইন, অর্থনীতি, ফিকাহ্, সামাজিক সুবিচার, জীবনধারা ও আরো বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

পারিবারিক জীবন

হুজ্জাতুল ইসলাম ড. সাইয়্যেদ ইবরাহীম রায়িসির সাথে ১৯৮৩ সালে–যখন তাঁর বয়স ২৩ বছর–স্বনামখ্যাত মুজ্তাহিদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ আহ্মাদ্ 'আলামুল্ হুদার জ্যেষ্ঠা কন্যা ড. জামিলাতুস সাদাত-এর বিবাহ হয়। ড. জামিলাতুস সাদাত তেহরানের শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রশিক্ষণ দর্শন' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এর আগে তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সর্বোচ্চ পরিষদের মানবিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সংস্থার প্রধান ছিলেন।

ড. রায়িসি ও বেগম রায়িসি দু'জন কন্যাসন্তানের পিতা-মাতা। তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা; তিনি আয্-যাহ্রা (সালামুল্লাহি 'আলাইহা) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে এবং রেই শাহ্রের হাদিসবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোরআন ও হাদিসবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। রায়িসি দম্পতির কনিষ্ঠা কন্যাও বিবাহিতা; তিনি শারীফ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশুনা করছেন।

ইরানে মসজিদের সংস্কৃতি : একটি শিক্ষণীয় বাস্তবতা

সিরাজুল ইসলাম

মসজিদ হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতির প্রতীক এবং প্রার্থনাস্থল। এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক স্থান। মসজিদ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম স্থান হলো মসজিদ।' মসজিদেই নামাজ আদায় করা হয় আর নামাজ হচ্ছে ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন বা স্তম্ভ, নামাজ হচ্ছে 'ইসলামের নির্যাস'। ফলে শুধু সাধারণ লোকজনের জন্য মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়া বা সংঘবদ্ধভাবে ইবাদত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি; বরং খ্যাতিমান ইসলামি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও জামায়াতে নামাজ পড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

মসজিদ হলো ইবাদাতের স্থান। কোরআন তেলাওয়াত করা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, নামাজ আদায় করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ইবাদাতের স্থান হলো মসজিদ। এইসব কাজের সুবিধার্থে সময়ের পরিক্রমায় মসজিদকে ঘিরে গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার, সরাইখানা, চিকিৎসাকেন্দ্র, মাদ্রাসা ও রান্নাঘর। মুসলমানরা তাদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিচিত্র চাহিদা মেটানোর জন্য মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করত। সাধারণত এই মসজিদ কমপ্লেক্স গড়ে উঠত শহরকে কেন্দ্র করে। সেজন্য এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ইসলামের আবির্ভাব থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কাছে মসজিদ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার অধিকারী। কেননা, মসজিদ হচ্ছে তাদের ইবাদাতের মূল কেন্দ্র। ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের স্থান মসজিদে এক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি সামরিক অভিযান সম্পর্কেও পরামর্শ করা হতো। মসজিদ ছিল মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলে মসজিদ বিচিত্র কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন নিঃস্বদের আবাসন, মুসাফিরদের যাত্রাবিরতি, সামাজিক কাজকর্মের কেন্দ্র এবং কোরআনসহ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা। পরবর্তীকালে জ্ঞানের 'আদর্শ নমুনা' এই মসজিদ থেকেই শুরু হয়ে বিস্তৃতি ও বিকাশ লাভ করেছে। তবে ইতিহাসের সকল পর্যায়েই মসজিদ ছিল আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাঁর সাথে নিজেদের চাওয়া-পাওয়া-প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পবিত্র স্থান। কিন্তু বর্তমানে নামাজ আদায় ও ওয়াজ মাহফিল ছাড়া মসজিদ তার অবশিষ্ট ভূমিকাগুলো খুব একটা পালন করতে পারছে না। প্রায় সারা বিশ্বেই একই অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া একান্তই জরুরি। তাতে দেশ, সমাজ ও সমাজের মানুষেরই উপকার হবে।

১৯৭৯ সালে ইরানে মহান ইসলামি বিপ্লব বিজয় লাভের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে মসজিদকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সময় ইরানের পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে শহরের বড় বড় মসজিদগুলোকে বিশেষ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। মসজিদের ইমামদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইমামরা শুধু 'নামাজ পড়ানো লোক' হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সমাজের নেতা হিসেবে গণ্য হতে শুরু করেন। মসজিদ হয়ে ওঠে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের বিরাট সেতুবন্ধন। বিপ্লবের পর মসজিদ আর শুধু নামাজের স্থান থাকল না; বরং এর নানামুখী ব্যবহার শুরু হলো। গড়ে উঠতে থাকল নতুন নতুন মসজিদ ও মসজিদ কমপ্লেক্স। এসব মসজিদ কমপ্লেক্সে রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড নির্বাচনের ভোট গ্রহণও

করা হয়ে থাকে।

মসজিদ তথা ইবাদাত-কেন্দ্রের নানামুখী ব্যবহারের বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে রাজধানী তেহরানে নির্মিত ইমাম খোমেইনী মুসাল্লার কথা বলতে পারি। আগে ইরানের রাজধানী তেহরানের কেন্দ্রীয় জুমার নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠিত হতো তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে। ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর ১৯৮২ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুমার নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠানের জন্য তেহরানের আব্বাস আবাদ এলাকায় মুসাল্লা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার পর ১৯৯০ সালে এর চূড়ান্ত নকশা গ্রহণ করা হয় যাতে ইরান, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান এবং জর্জিয়ার ইসলামি নির্মাণশৈলী ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়। তাজিকিস্তান, আজারবাইজান এবং জর্জিয়া প্রাচীনকালে ইরানের অংশ ছিল।

যাহোক, তেহরানে নির্মিত এই মুসাল্লার নাম দেওয়া হয়েছে ইমাম খোমেইনী মুসাল্লা। এখানে শুধু জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় না; বরং ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার নামাজের জামায়াতও অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম খোমেইনী মুসাল্লায় গড়ে তোলা হয়েছে সুবিশাল কমপ্লেক্স। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মসজিদ কমপ্লেক্স। এখানে ২৩০ মিটার উচ্চতার দুটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

ইমাম খোমেইনী মুসাল্লায় জুমা এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠান ছাড়া আরো যেসব কার্যক্রমে এটি ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো। ইমাম খোমেইনী মুসাল্লায় বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যেমন-

১. আন্তর্জাতিক কোরআন প্রদর্শনী

২. তেহরান ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার

৩. ইরানের খনি এবং খনিজ শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং

৪. আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী।

এবার আমরা ইরানের মাশহাদ শহরে ইমাম রেযা আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজার কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিতে পারি।

মাশহাদ শহরটি তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী একটি শহর। পবিত্র এই শহরেই রয়েছে নবী-বংশের অষ্টম ইমাম হযরত ইমাম রেযা আলাইহিস সালামের মাজার। এই মাজার কমপ্লেক্সে যে মসজিদ রয়েছে সেটি আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এছাড়া, মসজিদ কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি জাদুঘর, একটি বিশাল লাইব্রেরি এবং চারটি মাদ্রাসা, একটি কবরস্থান, রাজাভি ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, পর্যটকদের জন্য নির্মিত একটি বিশাল ডাইনিং হল, সুবিশাল নামাজের স্থান এবং আরো কয়েকটি ভবন।

ইরানে ঐতিহাসিক ও আকর্ষণীয় যেসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে ইমাম রেযার মাজার কমপ্লেক্স তার অন্যতম প্রধান। কানাডার বিশিষ্ট লেখক বেনি রাস্ক ইমাম রেযা (আ.)-এর মাজার কমপ্লেক্সের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি 'ইরান, ফিরোযা ব্রিজ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'মাশহাদে ইমাম রেযা (আ.)-এর মাজারের বিস্তৃত শাবেস্তান আর কবরের পাশের কারুকার্যময় খোলা আঙ্গিনা দেখতে খুবই সুন্দর। সেখানে সবাই একধরনের প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বোধ

করেন। গম্বুজের ভেতরের রং-বেরঙের দেয়াল চমৎকার সব টাইলসের কারুকাজে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, অন্যরকম এক ভালো লাগার সাথে সেখানে বিরাজ করে এক ঐশী গুঞ্জরণ। মানুষ এখানে অলৌকিক মাহাত্ম্য অনুভব করেন এবং মানুষকে যেন বেহেশতের পথ দেখায়। মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করেন এবং মারেফাতের নূর তাঁর অন্তরে আলো বিকিরণ করে। এই মাজার দেখার যে অনুভূতি তা বর্ণনা করার মতো কোনো ভাষা নেই।'

২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ইরান এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ ইমাম রেযার মাজার জিয়ারত করে থাকেন।

এই মাজার কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে আস্তান কুদস রাজাভি ফাউন্ডেশন যার নেতৃত্বে থাকেন ইরানের একজন প্রখ্যাত আলেম। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি একসময় এই আস্তান কুদস রাজাভি ফাউন্ডেশনের প্রধান ছিলেন।

ইমাম রেযা (আ.)-এর মাজার কমপ্লেক্সের মোট আয়তন ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৬৫৭ বর্গমিটার। এর মধ্যে শুধু মাজার এলাকার আয়তন ২ লাখ ৫৭ হাজার ৭৯ বর্গমিটার।

ইমাম রেযার মূল কবরের বেষ্টনীর ভেতরে সোনা ও রূপার যে বিচিত্র কারুকাজ, তার পাশাপাশি কাচের শিল্পকর্মে সজ্জিত ক্যানভাসে মৃদু আলোর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য যিনি একবার দেখেন, তিনি আর ফিরে আসতে চান না। বিখ্যাত ৭ জন ইরানি শিল্পী আড়াই বছর ধরে এসব কারুকাজ সম্পন্ন করেছেন। আধ্যাত্মিকতা ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের গুণে একটি মাজার ও মসজিদ কমপ্লেক্স ইরানের মতো একটি দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, কেবল ইবাদাতের স্থান হয়ে থাকে নি।

শুধু ইসলামি বিপ্লবের পরে নয়, বরং বিপ্লব সফল হওয়ার আগেও মহান ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেইনী তাঁর আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বানিয়েছিলেন মসজিদকে। ১৯৭৮ সালে যখন মোহাম্মদ রেযা শাহের স্বৈরতান্ত্রিক সরকার দেশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করল তখন ফ্রান্সের প্যারিস থেকে পাঠানো রেকর্ড একজন মসজিদের ইমাম রমজানের জুমার নামাজের খুতবা হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রাজধানী তেহরানে অন্তত ১৫ হাজার মানুষ বিক্ষোভে নামেন। তাঁদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালালে ৮৭ জন শহীদ এবং ২০৫ জন আহত হন। ইরানের ইতিহাসে এ ঘটনাকে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। প্যারিস থেকে ইমাম খোমেইনী (রহ) নতুন রেকর্ড পাঠিয়ে জনগণের প্রতি বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও আলেমদের প্রতি আহ্বান জানান এই কথা প্রচার করার জন্য যে, মসজিদ থেকেই ইসলামি বিপ্লবের শুরু। এর পরিণতিতে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহরানের রাজপথে কোটি মানুষের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়– 'আয়াতুল্লাহ খোমেইনী দেশের নেতা এবং রাজতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করা হলো, পরিবর্তে দেশে ইসলামি সরকার গঠিত হবে।' এই বিক্ষোভের পরে (১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯) মোহাম্মদ রেযা শাহ দেশ থেকে পালিয়ে যান এবং ১১ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে ইমাম খোমেইনী ইরানে ফিরে আসেন। এভাবে ইরানের বিপ্লব চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখে।

বলা যেতে পারে, ইরানের আলেমদের মসজিদভিত্তিক নেটওয়ার্ক বিপ্লব গড়ে তোলা ও মোহাম্মদ রেযা শাহের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। ইরানের শহর নগর ও গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার মসজিদ দেশব্যাপী

মানুষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক এবং প্রাকৃতিক যোগাযোগের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল।

ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার ব্যাপারে ইরানের মসজিদগুলো ইমাম খোমেইনী (রহ.)-কে বিরাটভাবে সাহায্য করেছিল। বিপ্লবের পর তিনি মসজিদগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে সেগুলোকে বিপ্লবের অর্জন সমাজে বাস্তবায়নের জন্য কাজে লাগাতে শুরু করলেন।

তিনি দেশে ফিরেই জুমার নামাজের বৃহৎ জামায়াত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন এবং ইরানের সমস্ত শহর-নগরের মসজিদগুলোতে জুমার নামাজের ইমাম নিয়োগ করলেন। বিপ্লবের নেতার প্রতিনিধি হিসেবে এসমস্ত ইমামের ওপর জুমার নামাজের খুতবা ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে বক্তব্য রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইরানে যে তামাকবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল এবং ১৯০৫ সালে যে সাংবিধানিক বিপ্লব হয়েছিল মসজিদ তাতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য এই ঐক্য ও সংহতির কোনো বিকল্প নেই। ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর ইরানের যেসব শহরে শিয়া ও সুন্নি মুসলমান বসবাস করেন সেসব শহরে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভূতপূর্ব উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় যাহেদান শহরের মুসলমানরা এক শুক্রবার একজন শিয়া আলেমের ইমামতিতে জুমার নামাজ আদায় করতেন এবং পরবর্তী শুক্রবার একজন সুন্নি আলেমের ইমামতিতে এই সাপ্তাহিক নামাজ আদায় করতেন। প্রথমদিকে এই নামাজের ইমামতি করেছেন মরহুম আয়াতুল্লাহ কাফআমি ও মরহুম মৌলভি আবদুল আজিজ। শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেটি ছিল একটি চমৎকার উদ্যোগ। পরস্পরের মসজিদে এবং ইমামতিতে নামাজ আদায় করার সময় তাঁরা ফিকাহ সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মসজিদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার আরেকটি উদাহরণ ইরানের সিস্তান ও বালুচিস্তান প্রদেশের 'খাশ' মসজিদ। প্রদেশের খাশ শহরে অবস্থিত এই মসজিদ শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। শহরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন, এখানে শুরু থেকেই দুই মাজহাবের মুসল্লিরা একত্রে নামাজ আদায় করতেন। খাশ শহরের জুমার নামাজের খতিব হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মাদ হোসেইন মিরি বলেছেন, মসজিদটিতে এখনো শিয়া ও সুন্নি মুসলমানরা একসঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন।

এতক্ষণ রাষ্ট্র ও সমাজে বিশেষ করে ইরানে মসজিদের নানামুখী গঠনমূলক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মসজিদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো। নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা বলতে পারি- মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে মসজিদের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। মুসল্লিরা যখন জামায়াতে সারিবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করেন তখন সমাজের এই মানুষগুলোর সামষ্টিক আচরণ প্রকাশ পায়। ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজে দাঁড়ালে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। পাশাপাশি অন্য সময়ে যখন মুসল্লিরা আলাদাভাবে মসজিদে উপস্থিত হন তখনও তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণ ও কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করেন। মসজিদে কেউ কোনো অবস্থায় স্বেচ্ছাচারী আচরণ করেন না এবং এখানকার এই প্রশিক্ষণটি মানুষের জন্য সমাজে চলার উত্তম পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায়কারী একজন মানুষ নিজেই তার স্বভাব-চরিত্রের খারাপ দিকগুলো বর্জন করে উন্নত গুণাবলি অর্জন করতে থাকেন। এটি একটি দীর্ঘ ও চলমান প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াতকারী ব্যক্তি সমাজের আদর্শস্থানীয় মানুষে পরিণত হয়ে যান। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের উপাসনালয়ের এরকম কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

নিয়মিত মসজিদে যাতায়াতকারী একজন মানুষ প্রতিনিয়ত ঈমানদার, নামাজি, মুত্তাকি ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পান। এসব ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমান ও আমল সবার সামনে উন্মুক্ত। ধর্মভীরু এসব মানুষ সাধারণভাবে সমাজে সবার শ্রদ্ধাভাজন হন। পারিবারিক ও সামাজিক কাজেকর্মে এমনকি অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এই মানুষগুলোর কথা ও দিক-নির্দেশনাকে সবাই সম্মান জানান। পক্ষান্তরে মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষেরা ইসলামি সমাজে কোনো অবস্থাতেই এরকম শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শুধু ইরান নয়– সব মুসলিম দেশেই মসজিদকে নানামুখী সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা দরকার। তাতে উন্নত চারিত্রিক মাধুর্যের মানুষে ভরে উঠবে প্রতিটি সমাজ, দেখা দেবে বৈষয়িক উন্নতি। সমাজে ছড়িয়ে পড়বে শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া।

লেখক : রেডিও তেহরানের সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট